গীতিনাট্য

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

- প্রথম দৃশ্য 4
- দ্বিতীয় দৃশ্য 8
- তৃতীয় দৃশ্য 15
- চতুর্থ দৃশ্য 19
- পঞ্চম দৃশ্য 26
- ষষ্ঠ দৃশ্য 29
- সপ্তম দৃশ্য 32
- অষ্টম দৃশ্য 36
- নবম দৃশ্য 39
- দশম দৃশ্য 41
- একাদশ দৃশ্য 44
- দ্বাদশ দৃশ্য 50
- ত্রয়োদশ দৃশ্য 53
- চতুর্দশ দৃশ্য 54
- পঞ্চদশ দৃশ্য 57
- ষোড়শ দৃশ্য 59

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনও বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা 'ছবি ও গান'। লেখনীর সেই নূতন বহির্মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধ হয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয় সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।

শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪০

প্রথম দৃশ্য

গুহা

সন্ন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস!
অবিশ্রাম কালস্রোতে কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম!
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার-মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।
বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া।
কখনো বা কোনো দিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।
জগৎ-কুয়াশা-মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ম কিরণে

ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া- আবরণ,
জগৎ চরণ তলে গিয়াছে মিলায়ে–
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়।
বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
কোটি- কোটি- যুগ- ব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয়- সলিলে
সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে–
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ- আভাস।
জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ!
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।
আমার হৃদয়রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবসরজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি।
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ,
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়,

রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।
বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো।
নিজের ছায়ারে নিজ বক্ষে ধরিবারে
দিনরাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস।
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে।
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়।
তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে।
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
এক দিন– এক দিন নেব প্রতিশোধ।
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল।
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজ মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোরি রঙ্গভূমিমাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সন্ন্যাসী

এ কী ক্ষুদ্র ধরা! এ কী বদ্ধ চারি দিকে!
কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা।
এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!
চারি দিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা।
চারি দিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর।
আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।
পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনি নে আমি, বুঝিতে পারি নে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা?
এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।
দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

কৃষকগণের প্রবেশ

গান

হেদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হেরো গো প্রভাত হল সুয্যি উঠে
ফুল ফুটেছে বনে–
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু

বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা,
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

[প্রস্থান
বালক-পুত্র সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিনসে আবার রাগ করবে। পথে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেসপড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে এক বার পায়ের ধুলো পড়ে না!

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকড়াইভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও।

আর এক স্ত্রীলোক। এই-যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্‌গি হয়েছ।

ব্রাহ্মণ। মাগ্‌গি আর হলেম কই। সক্কালবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেছিস। তবু তো আমার সেকাল নেই।

প্রথমা। আমি যাই ভাই, ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। তা এস।

প্রথমা। (পুনর্বার ফিরিয়া) হ্যাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই-যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

দ্বিতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা।

[সকলের চুপি চুপি কথোপকথন
আর-কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

প্রথম। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখতে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয়। ঠিক কথা। তা না হলে তো সে জব্দ হবে না।

প্রথম। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব।

তৃতীয়। শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।

চতুর্থ। লোকটার বড়ো বাড় বেড়েছে।

পঞ্চম। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দ্বিতীয়। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

চতুর্থ। আচ্ছা, তুমি কী করবে শুনি দাদা!

দ্বিতীয়। কী না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে শহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

[ক্রোধে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে অন্য পথিকগণের অনুগমন

প্রথম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারি নে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল। আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর-এক দিন আসতে হবে। (সক্রোধে) পোড়ারমুখো ছেলে, তোর জন্যেই তো যাওয়া হল না, তুই আবার পথের মধ্যে খেলতে গিয়েছিলি কোথা?

ছেলে। কেন মা, আমি তো এইখেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই করছিস!

[প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান

দুই জন ব্রাহ্মণ-বটুর প্রবেশ

প্রথম। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

দ্বিতীয়। কখনো না, জনার্দন পণ্ডিতই জয়ী।

প্রথম। শাস্ত্রী বলছেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়। গুরু জনার্দন বলছেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

www.bengaliebook.com

প্রথম। সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়। সেই তো বেদবাক্য।

প্রথম। কেমন করে হবে! বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ, বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

প্রথম। আগে দিন না আগে রাত?

দ্বিতীয়। আগে রাত।

প্রথম। কেমন করে! দিন না গেলে তো রাত হবে না!

দ্বিতীয়। রাত না গেলে তো দিন হবে না।

প্রথম। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্ন্যাসী। কী সংশয়?

দ্বিতীয়। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবছি স্থূল হতে সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারছি নে।

সন্ন্যাসী। স্থূল কোথা! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।
সবই সূক্ষ্ম, সবই শক্তি, স্থূল সে তো ভ্রম।

প্রথম। আমিও তো তাই বলি। আমার মাধব গুরুও তো তাই বলেন।

দ্বিতীয়। আমারও তো ঐ মত। আমার জনার্দন গুরুরও তো ওই মত।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চললেম প্রভু।

[বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসী। হা রে মূর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু।
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা।
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে–
মুঠো মুঠো বাক্যধুলা আঁচল পুরিয়া,
আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

এক দল মালিনীর প্রবেশ

গান

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়,
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের! মালা যদি থাকে তো গলাও ঢের আছে।

মালিনী। হাড়কাঠও তো কম নেই।

দ্বিতীয় মালিনী। পোড়ারমুখো মিন্‌সে, গোরুবাছুর নিয়েই আছে। আর,আমি যে গলা ভেঙে মরছি, আমার দিকে এক বার তাকালেও না! (কাছে গিয়া গা ঘেঁষিয়া) মর্‌ মিন্‌সে গায়ের উপর পড়িস কেন?

সেই লোক। গায়ে পড়ে ঝগড়া কর কেন! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

দ্বিতীয় মালিনী। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক! না হয় একটু কাছেই আসতে! খেয়ে তো ফেলতুম না।

[হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ

গান

ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হন, ধনের উপর বাড়ুক ধন–
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে–
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি চলতে আর যে পারি নে।

ওরে, তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে–
একটি মুঠো দিবি শুধু, আর কিছু চাহি নে।

একদল সৈনিক। (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে। বেটা, চোখ নেই! দেখছিস নে মন্ত্রীর পুত্র আসছেন!

[বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান

সন্ন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ম রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
সকাল হইতে আছি, কী দেখিনু হেথা?
এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক’রে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার।
কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহা আলয়।
জগতের বাধা নাই – শূন্যে করি বাস।

তৃতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ন। পথ

প্রথম পথিক। পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পথিক। ছুঁস নে ছুঁস নে মোরে–
দ্বিতীয় পথিক। সরে যা অশুচি।
তৃতীয় পথিক। হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক–
ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে!

বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন

একজন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিনী বেশে কেন রয়েছে দাঁড়ায়ে
এক পাশে?

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। জননী গো আমি অনাথিনী।
বৃদ্ধা। আহা মরে যাই!
পথিকগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে–

কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু,
তাহারি দুহিতা ও যে!
বৃদ্ধা। ছি ছি ছি, কী ঘৃণা।!
[প্রস্থান
দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া

বালিকা। জগৎ-জননী মাগো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও কি, মা ত্যেজিবে অনাথে?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে
সে কি, মা, তোমারো কোলে পায় না আশ্রয়?
মন্দিররক্ষক। দূর হ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি!
কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে!

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

জননী। আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয়।
আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন।
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব,
অকল্যাণ যত কিছু যাবে দূর হয়ে।
কন্যা। ও কে ও মা!
জননী। ও কেউ না, সরে আয় বাছা।!
[প্রস্থান
বালিকা। এ কি কেউ না মা! এ কি নিতান্ত অনাথা!
এর কি মা ছিল না গো! ও মা, কোথা তুমি!
সন্ন্যাসীকে দেখিয়া
প্রভু, কাছে যাব আমি?
সন্ন্যাসী। এসো বৎসে, এসো।
বালিকা। অনার্যা অশুচি আমি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হাসিয়া
সন্ন্যাসী। সকলেই তাই।
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন! ভয় নাই বাছা।
চমকিয়া
বালিকা। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা।
সন্ন্যাসী। নাম কি তোমার বৎসে?
বালিকা। কেমনে বলিব?
কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভু গো,
বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি।
সন্ন্যাসী। বোসো হেথা।

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
এক বার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর করে দিয়ো না কখনো।
সন্ন্যাসী। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইকো কাহারো ' পরে ঘৃণা-অনুরাগ।
যে আসে আসুক কাছে, যায় যাক দূরে,
জেনো বৎসে, মোর কাছে সকলি সমান।
বালিকা। আমি, প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই–
সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।
বালিকা। তোমার কি মাতা নাই?
সন্ন্যাসী। নাই।
বালিকা। পিতা নাই?

সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।

বালিকা। সখা কেহ নাই?

সন্ন্যাসী। কেহ নাই।

বালিকা। আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে?

সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।

বালিকা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে–
রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
অনার্য অশুচি ও যে ম্লেচ্ছ ধর্মহীন–
তখনো কি ত্যেজিবে না? রাখিবে কি কাছে?

সন্ন্যাসী। ভয় নাই, চল্ বৎসে, তোর গৃহ যেথা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটির

বালিকা। পিতা!
সন্ন্যাসী। আহা,পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে!
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।
বালিকা। কী শিক্ষা দিতেছ প্রভু, বুঝিতে পারি নে।
শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে,
মুখ তুলে মুখপানে কে চাহিবে মোর?
সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসারমাঝে!
এ জগৎ অন্ধকারে প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় বলে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া,
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষরাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারি দিক হতে আসিছে অতিথি।
যত খায় ক্ষুধা জ্বলে, বাড়ে অভিলাষ,
অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মতো
জগৎ মুঠায় করে মুখেতে পুরিতে।
হেথা হতে চলে আয় – চলে আয় তোরা।
বালিকা। এখানে তো সকলেই সুখে আছে পিতা।
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!
সন্ন্যাসী। হায় হায়, ইহাদের বুঝাব কেমনে!

সুখ দুঃখ সে তো, বাছা জগতের পীড়া!
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু – অনন্ত যন্ত্রণা!
মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু–
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে
পড়িছে সমুদ্রমাঝে, ফুরায় না তবু –
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান!
বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে–
দু-দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।
বালিকা। কী কথা বলিছ পিতা ভয় হয় শুনে।

পথে এক জন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?
সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথাও নাই – কে চাহে আশ্রয়?
আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা-কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়পাথারে।
পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে? আশ্রয় কোথায়?

বাহিরে আসিয়া

বালিকা। আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটিরে?

কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর করে।
একপাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,
এনে দেব ফলমূল নির্ঝরের জল।
পথিক। কে তুমি গো?
বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি।
পথিক। পিতার কী নাম তব? কে তুমি বালিকা?
বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে?
তবে শুন পরিচয় – রঘু পিতা মম,
অনার্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত।
চমকিয়া
পথিক। রঘুর দুহিতা তুমি? সুখে থাকো বাছা!
কাজ আছে অন্যত্তরে, ত্বরা যেতে হবে।
[প্রস্থান

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে এক দল লোকের প্রবেশ

সকলে মিলিয়া। হরিবোল– হরিবোল!

প্রথম। বেটা এখনো জাগল না রে।

দ্বিতীয়। বিষম ভারী।

এক জন পথিক। কে হে, কাকে নিয়ে যাও।

তৃতীয়। বিন্দে তাঁতি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, বেটাকে খাটসুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরিবোল– হরিবোল!

দ্বিতীয়। আর ভাই বইতে পারি নে, একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ উঁ উঁ!

তৃতীয়। ওরে, শব্দ করে কে রে।

বিন্দে। ওগো, ওগো, এ কী! আমি কোথায় যাচ্ছি!

সকলে। (খাট নামাইয়া) চুপ কর্‌ বেটা!

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয়। শালা মরে গিয়েও কথা কয়!

চতুর্থ। তুই যে মরেছিস রে! হাত-পাগুলো সিধে করে চিত হয়ে পড়ে থাক্ ।

বিন্দে। আমি মরি নি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম।

পঞ্চম। মরেছিস তোর হুঁশ নেই, তুই তর্ক করতে বসলি! এমনি বেটার বুদ্ধি বটে!

ষষ্ঠ। ওর কথা শোন কেন! বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বলছে।

সপ্তম। মিছে দেরি কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চলো ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসি গে।

বিন্দে। দোহাই বাবা, আমি মরি নি। তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরি নি।

প্রথম। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস নি।

বিন্দে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার স্ত্রীর হাতে শাঁখা আছে দেখবে চলো।

দ্বিতীয়। না, তা না, ওকে মার্, দেখি ওর লাগে কি না।

তৃতীয়। (মারিয়া) লাগছে?

বিন্দে। উঃ!

চতুর্থ। এটা কেমন লাগল?

বিন্দে। ও বাবা!

পঞ্চম। এটা কেমন?

বিন্দে। তুমি আমার ধর্মবাপ।

[সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন

সন্ন্যাসী। আহা শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে!
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর-জ্বালা।
কঠিন মাটিতে শুয়ে শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।
যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি
হৃদয়েরে অতি ধীর করিছে বেষ্টন।

www.bengaliebook.com

পালা, পালা, এইবেলা, পালা এইবেলা।
ঘুমিয়েছে, এইবেলা ওঠ্‌ রে সন্ন্যাসী!
পলায়ন! পলায়ন! ছি ছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে,
বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে!
কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি।
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ যত!
এ ঊর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

চমকিয়া জাগিয়া

বালিকা। প্রভু চলে গেছ তুমি! গেছ কি ফেলিয়া!
সন্ন্যাসী। কেন যাব! কার ভয়ে পলাইব আমি!
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে।
বালিকা। ওই শোনো, রাজপথে মহা কোলাহল।
সন্ন্যাসী। কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে।
একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা স্ত্রী। (কোনো পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালোবাসা দেখাতে হবে না!

প্রথম পুরুষ। কেন, কী অপরাধ করলুম?

স্ত্রী। জানি গো জানি, তোমরা পুরুষ-মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ।

প্রথম পুরুষ। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুলশরকে কেন ডরাই? (অন্য সকলের প্রতি) কী বল ভাই? যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুলশরের আঁচড় লাগে!

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা, বেশ বলেছ।

সূচিপত্র

তৃতীয় পুরুষ। শাবাশ, খুড়ো, শাবাশ।

চতুর্থ পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন! এখন জবাব দাও।

প্রথম পুরুষ। না, তাই বলছি। তোমরা তো দশ জন আছ, তোমরাই বিচার করে বলো-না কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে,তবে–

পঞ্চম পুরুষ। ঠিক কথা বলেছ। তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে।

ষষ্ঠ পুরুষ। খুড়ো এক-একটা কথা বড়ো সরেস বলে।

সপ্তম পুরুষ। হাঁঃ আমিও অমন বলতে পারতুম। ও কি আর নিজে বলে? কোন্ এক পুঁথি থেকে পড়ে বলছে।

অষ্টম পুরুষ। (আসিয়া)। কী হে কী কথাটা হচ্ছে? কী কথাটা হচ্ছে?

প্রথম পুরুষ। শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি। এই উনি বলছিলেন, তোমরা পুরুষ-মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ। তাইতে আমি বললেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুলশরের আঁচড় লাগবে কী করে? বুঝেছ ভাবখানা? অর্থাৎ যদি–

অষ্টম পুরুষ। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা। আমি আর বুঝি নি! আজ বাইশ বৎসর ধরে আমি নিজ শহরে গুড়ের কারবার করে আসছি আর একটা মানে বুঝতে পারব না এ কোন্ কথা।

প্রথম পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া গান

কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

একজন পুরুষের গান

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে,
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে।
ঢিপঢিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা দাদা, বেশ গেয়েছ।

তৃতীয় পুরুষ। বেশ, বেশ, সাবাশ।

সপ্তম পুরুষ। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে। গাইত বটে নিতাই; যে হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়ত।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

বালিকা। না পিতা, ও-সব কথা বলো না আমারে–
শুনে ভয় করে শুধু, বুঝিতে পারি নে।
সন্ন্যাসী। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন–
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।

এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহঘোর?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান?

দূরে সরিয়া

বালিকা, এ সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কী আশায়?
বালিকা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে।
সন্ন্যাসী। পিঞ্জরের ছোটো পাখি আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে!
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,
আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায়!

আহা, তবে নেবে আয়। থাক্ মুখ ঢেকে।
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।
এ কি স্নেহ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে?
না না। স্নেহ কোথা মোর! কোথা দ্বেষ ঘৃণা!
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

প্রকাশ্যে

বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি?
তোরা সব ছোটো ছোটো আলোকের প্রাণী।
কুটির রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোকজন, গাছপালা, পাখি–
হেথায় কে আছে তোর!
বালিকা। তুমি আছ পিতা।
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব।

হাসিয়া। স্বগত

সন্ন্যাসী। বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে?
হায় হায়, এ কী ভ্রম! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।
তাই মনে করে যদি সুখে থাকে থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

প্রকাশ্যে

যাই বৎসে, গুহামাঝে করি গে প্রবেশ,
এক বার বসি গিয়ে সমাধি-আসনে।
বালিকা। ফিরিবে কখন পিতা?
সন্ন্যাসী। কেমনে বলিব,
ধ্যানে মগ্ন, নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান।
[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অপরাহ্ন

গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালিকা।   এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা–
পিতা, আমি তোমা তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফলফুল তুলে।
দেখো চেয়ে কী সুন্দর রাঙা দুটি ফুল।

হাসিয়া
সন্ন্যাসী।   দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুশি।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিত।
এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোর
এক মুঠা ধুলা সেও কী করিল দোষ?
ভালো মন্দ কেন লাগে? সবই অর্থহীন।
আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কী করে?
বালিকা।   ওই দেখো–চুপি চুপি এস এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে।
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডালগুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি করে।
এস পিতা, এইখানে বসো এর কাছে –
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।

স্বগত

সন্ন্যাসী। এ কী রে মদিরা আমি করিতেছি পান।
এ কী মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কী রে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরানে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ- আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।

সহসা ফুল ফল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া,
ভূমিতে পদাঘাত করিয়া

দূর হোক – এ সকল কিছু ভালো নয় –
বালিকা, বালিকা তোর এ কী ছেলেখেলা।
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন?

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া

বাছা রে, অমন করে চাহিয়া কেন রে!
কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল।
জানিস নে তুই, মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী,
আমাদের এ-সকল ভালো নাহি লাগে।
ছিছি, জনমিল প্রাণে এ কী এ বিকার!
সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল!
কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!
কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল ফুঁসিয়া!

এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি!
হৃদয়ে লুকানো আছে এ কী বিভীষিকা!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু তো জানি নে।
হৃদয়শ্মশান মাঝে মৃতপ্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

প্রকাশ্যে

দাও বৎসে, এনে দাও ফলফুল তব,
দেখাও কোথায় বাছা লতাটি তোমার –
না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে।
দু দণ্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি।
[প্রস্থান

www.bengaliebook.com

সপ্তম দৃশ্য

পর্বতশিখরে সন্ন্যাসী

পর্বতপথে দুই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গান

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু, মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরান-বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

সন্ন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর!
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি!
পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে।
নিম্নে বনভূমিমাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণছায়া উপরে পড়েছে।
চারি দিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।

বামে দূরে দেখা যায় শৈলপদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন
দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু-একটি ক'রে–
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খঘণ্টা বাজে।
প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো–
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর,
দূর হতে বসে বসে দেখি-না চাহিয়া!
হেথায় বসি-না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়াঅভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্রসূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোরে পূজা।
উঠুক রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

আর এক দল পথিকের প্রবেশ

গান

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না–
ওই যে, বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি?

শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে–
ওগো তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
সন্ন্যাসী। জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মতো,
আমি তীরে বসে আছি পর্বতশিখরে–
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণকুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার ছায়া, জীবন মরণ,
রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর,
তবে কেন এই নৃত্য দেখি- না বসিয়া!

এক জন পথিক

গান

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক্‌বসনে।
মহা আনন্দে পুলককায় গঙ্গা উথলি ছলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আয় তোরা, কাছে আয় কে আসিবি আয়–
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।
বালিকা। আমিও কি কাছে যাব! ডাকো পিতা ডাক!,
কী দোষ করিয়াছিনু বলো বুঝাইয়া!
সন্ন্যাসী। কিছু ভয় করিস নে, কোনো দোষ নেই –
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।

গুহার কাছে গিয়া

এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয়, বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি এক বার।

বাহিরে আসিয়া

আহা এ কী সুমধুর! এ কী শান্তি-সুধা!
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ঐ তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মরবিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি।

এমনি জোছনা-রাত্রে কোন্‌খানে ছিনু,
কারা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর!
তোরি মতো দু-একটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।
আর না রে, আর না রে, আর ফিরিব না।
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি।
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়–
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগুলি –
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

কাছে আসিয়া

বালিকা। গান পড়িতেছে মনে গাই বসে পিতা!

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে ‘ আয় আয়’ ।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, ‘কোথায় – কোথায়!’
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী সে সেথা আছে,

আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায়।
   সুদূরে – অতি – অতি দূরে,
   বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।
   মেঘেরা তাই হেসে হেসে
   আকাশে চলে ভেসে ভেসে
নুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।
সন্ন্যাসী।   এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়?
বুঝি আর আপনারে পারি নে রাখিতে।
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই।
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে,
সর্বাঙ্গে চাপিছে ভার আঁখি মুদে আসে।
চৌদিকে কী যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ!
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে রে যেতেছিস চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত,
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া।
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।
যত চন্দ্র সূর্য সেথা ডুবে নিবে যাবে।
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।

নবম দৃশ্য

গুহায় সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী। আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল–
'আছি' মাত্র রবে শুধু, আর কিছু নয়।

দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ

বালিকা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা,
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি,
তাই আজ এক বার এসেছি দেখিতে।
একটিও জনপ্রাণী আসে নি হেথায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ!
কতক্ষণ বসে বসে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে।
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা–
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ও কী প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি!
ও কী ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে!
ভালো লাগিছে না পিতা? যাব তবে চলে?
সন্ন্যাসী। না না, এলি যদি, তবে যাস নে চলিয়া।
আমি তো ডাকি নি তোরে, নিজে এসেছিস!
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?

সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ!
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর!
মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা!
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।
তুই কি রে মিথ্যা মায়া, দু দণ্ডের ভ্রম!
জগতের কাছে তুই ফুটেছিস ফুল
জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে!
চল্ বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী –
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।
[প্রস্থান

দশম দৃশ্য

গুহার বাহিরে

সন্ন্যাসী। আহা এ কী চারিদিকে প্রভাতবিকাশ!
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি!
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ –
কে আছে কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে?
বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই – সীমা সে তো ভ্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারি দিকে করিবে ভ্রমণ,
ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

দুই জন পথিকের প্রবেশ

সূচিপত্র

প্রথম। আর কতদূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই।
আয় ভাই, এইখানে কোলাকুলি করি।
দ্বিতীয়। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
প্রথম। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
দ্বিতীয়। যাবে যদি, এক বার দাঁড়াও হেথায়।
এক বার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার–
চারি দিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে বসে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি।
প্রথম। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে,
আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন।
দ্বিতীয়। মনে যেন রেখো, সখা সুদূর প্রবাসে–
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিয়ো না যেন।
দেবতা রাখুন সুখে আর কী কহিব।
[প্রস্থান
সন্ন্যাসী। আহা, যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভালো করে দেখিতে না পায়।
বিপুল জগৎ-মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা,
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল
হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না।
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারি দিক হতে,

যাহা-কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের
আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক-লোকান্তের ব্যবধান পড়ে।
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন!
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা!
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস!
ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি, যেন
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে।
প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে –
চারি দিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।

যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল্ ছুটে চল্!
চল্ দূরে – যত দূরে চলে রে চরণ।
কে ও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্যগুহা-মাঝে,
কে ও রে পশ্চাতে ডাকে 'পিতা পিতা' ব'লে!
ছিঁড়ে ফেল্,ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা –
হেথা হতে চল্ ছুটে, আর দেরি নয়।

একাদশ দৃশ্য

পথে সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী।   এসেছি অনেক দূরে – আর ভয় নাই।
পায়েতে জড়াল লতা, ছিন্ন হয়ে গেল।
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
বসে বসে কাঁদিতেছে ডাকিতেছে সদা!
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া –
কিছুতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়।

নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া।
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোটো ছোটো সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে।
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে।
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে!
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,
পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া–
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই!

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ

বালিকা।   ওগো, দয়া করো মোরে আমি অনাথিনী।

সহসা চমকিয়া উঠিয়া

সন্ন্যাসী।   কে রে তুই? কে রে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মতো তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াস?
বৎসে, কাছে আয় তুই – দে রে পরিচয়।
বালিকা।   ভিখারি বালিকা আমি, সন্ন্যাসী ঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী।
আসিয়াছি একমুঠা ভিক্ষান্নের তরে।
সন্ন্যাসী।   আহা বৎসে, নিয়ে চল্ কুটিরেতে তোর।
রুগ্ণ তোর জননীরে দেখে আসি আমি।
[প্রস্থান
কতকগুলি সন্তান লইয়া এক জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্ দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখলে দু-দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে – আর এঁদের ছিরি দেখো-না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাতকুলে কেউ নেই, যেন সাত জন্মে খেতে পান না।

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা! আমাদের দোষ কী?

মা। বললেম—বলি, রোজ সকালে ভালো করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর্, ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে– তা তো কেউ শুনবে না! আহা ওদের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, রং যেন দুধে-আলতায় –

সন্তানগণ। আমাদের রং কালো তা আমরা কী করব?

মা। তোদের রং কালো কে বললে? তোদের রং মন্দ কী? তবে কেন ওদের মতো দেখায় না?
[প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ। একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা।
স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর!
ঘরেতে যেতেছি মোরা।
সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে?
স্ত্রী। শাশুড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে দুটি ছেলে আছে।
সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা!
স্ত্রী। ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গোরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।
সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন? দুঃখ কিছু নেই?
স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু! রামরাজ্যে থাকি।
সন্ন্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা!
স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর।

কন্যার প্রতি

যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ।
সন্ন্যাসী। আয় বৎসে, কাছে আয় কোলে করি তোরে।
আসিবি নে! তুই মোরে চিনেছিস বুঝি –
নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষাণ হৃদয়,
আমারে বিশ্বাস করে আসিস নে কাছে!

মাকে টানিয়া

কন্যা। মা গো, ঘরে চলো।
স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।
সন্ন্যাসী। যাও বাছা, সুখে থাকো আশীর্বাদ করি।
[সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান
বসে বসে কী দেখি এ, এই কি রে সুখ!
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসারসাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য-সনে নৃত্য করিতেছে।
দু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে।
আমি তো পেয়েছি কূল অটল পর্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস।
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ-সাধ!
ওই অশ্রুসাগরের তরঙ্গহিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি!

চক্ষু মুদিয়া

হৃদয় রে শান্ত হও, যাক সব দূরে—
যাক দূরে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা।
এস এস অন্ধকার, প্রলয়সমুদ্রে
তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া।
অকুল স্তব্ধতা এসো চারি দিকে ঘিরে,
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির।
গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিবে গেল।

বালিকার প্রবেশ

www.bengaliebook.com

বালিকা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা!

চমকিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই!
চিনি নে, চিনি নে তোরে, কোথা হতে এলি!
বালিকা। আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা, আমি!
সন্ন্যাসী। চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা।
আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন।

পায়ে পড়িয়া

বালিকা। আমাকে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি।

সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া

সন্ন্যাসী। আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা!
ভেঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে!
আর তোরে ফেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে।
পদাঘাতে ভেঙেছিনু জগৎ আমার –
ছোটো এ বালিকা এর ছোটো দুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।
আহা তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর।
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্ন-তপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলি রে!

আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।
[প্রস্থান

দ্বাদশ দৃশ্য

গুহার দ্বারে

সন্ন্যাসী। এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি!
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয়-আঁধারে
সহসা তারার মতো কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে–
গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।
সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়তো সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়তো কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদো-কাঁদো মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
মিছে ধ্যান মিছে জ্ঞান মিছে আশা মোর!
আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে –
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া –

ক্রমেই দুর্বল দেহ শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।
ধুলায়, মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে।
লৌহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।
তবে কি রে আর কিছু নাইকো উপায়!
বালিকা। দেখো পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া।

সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল

বালিকা। ও কী হল! ও কী হল! কী করিলে পিতা!
সন্ন্যাসী। রাক্ষসী পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী –
দূর হ, এখনি তুই যা রে দূর হয়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু-মাঝে।
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস করে দিলি!
ওরে, তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি –
প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল।
তুই রে আলোয়-আলো, তুই মরীচিকা–
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে,
কোন্ মরুভূমি-মাঝে, শ্মশানের পথে,
কোন্ মরণের মুখে যেতেছিস নিয়ে!
ওই-যে দেখি রে তোর নিদারুণ হাসি,
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই –
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী!
এখনো কি আশা তোর পুরে নি পাষাণী?

এখনো করিবি মোরে আরো অপমান!
আরো ধুলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর!
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি!
না রে না, তা হবে না রে, এখনো যুঝিব –
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল।

সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন
ও মূর্ছিত হইয়া বালিকার পতন

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

ঝড়বৃষ্টি। রাত্রি

সন্ন্যাসী। কে ও রে করুণকণ্ঠে করে আর্তনাদ!
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া!
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী–
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে!
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
পারিলি নে ডুবাইতে! এখনো শুনি যে!
ওই -যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে,
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি।
কোথা যাব, কোথা যাব, কোন্ অন্ধকারে –
জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে –
ধরণীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে–
এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!
যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে –
মহাকায় তরুদের জটিলতা-মাঝে
দিগ্বিদিক হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই।

চতুর্দশ দৃশ্য

প্রভাত

অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া

সন্ন্যাসী। যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত!

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী!
পাষাণসংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি এক বার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে –
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।
পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে, 'এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,'
যত ওড়ে – যত ওড়ে– যত ঊর্ধ্বে যায় –

কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে,
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

চারিদিকে চাহিয়া

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি!
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া!
কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।
আহা, কাছে যাই তার— বুকে নিয়ে তারে

শুধাই গে কী হয়েছে কী করেছি আমি!
একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী–
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।
[প্রস্থান

www.bengaliebook.com

পঞ্চদশ দৃশ্য

পথে

লোকারণ্য

প্রথম পুরুষ। ওরে আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে।

দ্বিতীয় পুরুষ। তা তো জানি।

তৃতীয় পুরুষ। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।

চতুর্থ পুরুষ। রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে, কিন্তু ভাই আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজলে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগডুগি বাজিয়েছি।

স্ত্রীলোক। হাঁ গা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে, তা মুড়িমুড়কি বিলোনো হবে না?

প্রথম পুরুষ। দূর মাগি, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা –

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিতে ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে।

প্রথম পুরুষ। ওরে ও সর্দারের পো, আজ আবার কাজ করতে বসেছিস কেন, ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।

দ্বিতীয় পুরুষ। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

তৃতীয় পুরুষ। না রে ভাই, বসে বসে মালা গাঁথছি, দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রীলোক। (রুদ্যমান সন্তানের প্রতি) চুপ কর্,কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, আজ রাজপুত্তুরের বিয়ে – আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি। [কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী।   জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম পথিক। ঠাকুর, প্রণাম হই।
দ্বিতীয় পথিক।   প্রভু গো, প্রণাম।
তৃতীয় পথিক। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্বাদ করো।
চতুর্থ পথিক। পদধূলি দাও প্রভু, নিয়ে যাই শিরে।
পঞ্চম পথিক। এনেছি চরণে দিতে গুটি-দুই ফুল।
সন্ন্যাসী।   কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই ওঠো –
এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার?
শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয়!
তার মলান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের!
সে বালিকা কোথাও কি পায় নি আশ্রয়?

ষোড়শ দৃশ্য

গুহামুখ

ধুলায় পতিত বালিকা

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ

সন্ন্যাসী। নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি –
ধুলায় পড়িয়া কেন – ওঠ্ মা, ওঠ্ মা–
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস কেন?
আয় রে বুকের মাঝে – এও তো পাষাণ!
ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন!
মুখখানি তুলে দেখ্, দুটো কথা ক!
এ কী, এ যে হিম দেহ! না পড়ে নিশ্বাস –
হৃদয় কেন রে স্তব্ধ, বিবর্ণ মুখানি!

বাছা, বাছা, কোথা গেলি! কী করিলি রে –
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!